সম্পাদকীয়

স্বাধিকার ■ ৭ সেপ্টেম্বর ২০০৫ ■ বুলেটিন নং ৩৪

তোমাকে বধিবে যে.....

১৭ আগস্ট সারা দেশ ব্যাপী চার শতাধিক স্থানে বোমা হামলার মাধ্যমে ইসলামী জঙ্গিবাদীরা তাদের শক্তি ও সামর্থ্যের মাত্রা দেখিয়ে দিয়েছে। এরা কি চায় তাও স্পষ্ট। জিহাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসলামী বিপ্লব ঘটিয়ে দেশের রাষ্ট্রপতি দখল করা। এ লক্ষ্যে তারা গত কয়েক বছর ধরে গোপনে কাজ চালিয়ে আসছিল। তাদের দু'একটি সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণার পরও এ কাজ থেমে থাকেনি। এখনো থেমে আছে বলে মনে হয় না। এক সময় এদের চরমপন্থী শিষ্যদের সাথে খোদ সরকারি দল-জোটাদিতে খোশগল্প ও সরকারী দলের মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যের প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ সমর্থন লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

এইসব জঙ্গিবাদীদের উত্থান একদিনে হয়নি এবং উত্থানের কারণও অনেক হতে পারে। প্রথমত, ধর্মীয় ধ্বজা থেকে জিহাদী থেকে লাভ করে জঙ্গি তৎপরতার দিক হওয়ার কথা বলা হলেও, এটা হলো বর্তমান বিশ্বের আর্থ-রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি পশ্চাদমুখী প্রতিক্রিয়া। সে কারণে এই ধর্মীয় জঙ্গিবাদ একটি বিশ্বজনীন ব্যাপার এবং ধর্মীয় লেবাসে এদের চরিত্র ও লক্ষ্য সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এদের শক্তি বৃদ্ধির অন্যতম কারণগুলো হলো, রাষ্ট্র পরিচালনায় আওয়ামী লীগ-বিএনপিসহ শাসক দলগুলোর চরম ব্যর্থতা সত্ত্বেও ক্ষমতাসীন ও ক্ষুব্ধ বিপক্ষের শক্তিগুলোর জাতীয় রাজনীতিতে সুদৃঢ় অবস্থান নিয়ে আবির্ভূত হতে না পারা, মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার ও এতে সরকারসমূহের উদার পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান, দেশের স্বাধীন সংগ্রামে বিরোধীতা সত্ত্বেও মৌলবাদী দলগুলোর রাজনীতি নিষিদ্ধ না করা, মধ্যপ্রাচ্যসহ বিভিন্ন দেশ থেকে ধর্মীয় এনজিও-র মাধ্যমে বিপুল অর্থের যোগান ইত্যাদি।

সাধারণ মানুষের ধর্ম চর্চা আর ইসলামী জঙ্গিবাদ এক জিনিস নয়। ধর্মীয় জঙ্গীবাদীরা সাধারণ মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিকে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করতে চায়। স্বাধীনতার পর থেকে ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে গিয়ে এদের আজ এত বাড় বাড়ন্ত। মুখ ফুটে বলা গিয়ে এতকাল যে মৌলবাদী অপশক্তিকে পোষা হয়েছে, অবশেষে দল হলো আজ তারা ছোবল মারতে উদ্যত হয়েছে। ভেবেছিল বলিনে যে গোকুলে বাড়িছে সে। নদীর ওপারের গোকুল গ্রাম নয়, এরা সরকারের নাকের ডগাবাই বেড়ে উঠেছে।

ইসলামী জঙ্গীবাদ কর্পোরেট-নিয়ন্ত্রিত এক বিশ্বব্যবস্থার একটি পশ্চাদমুখী প্রতিক্রিয়া হলেও, এই দুইটি হলো একই মুদ্রার এপিট-ওপিট। অস্তিত্বের জন্য এদের মধ্যে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা (symbiotic relationship) এখন প্রমাণিত সত্য। অতীতের সোভিয়েত বাণিজ্যের বিরুদ্ধে এরা ছিল ঐকবদ্ধ। বর্তমানে তাদের মধ্যে যে সম্পর্ক তা ঐ সম্পর্কেরই বিপরীত, তবে প্রাসঙ্গিক জন মাত্র। অবশ্য এক্ষেত্রে ইরাক, আফগানিস্তানসহ বিভিন্ন দেশে যে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলছে তার সাথে একে গুলিয়ে ফেলা হবে মুর্খতা।

মৌলবাদী ও জঙ্গীবাদীদের প্রতিরোধের জন্য সরকার প্রগতিশীল ও প্রকৃত গণতান্ত্রিক শক্তির নেতৃত্বে একটি গণআন্দোলন গড়ে তোলা।

পার্বত্য চট্টগ্রামে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস

পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী "অপারেশন উত্তরণ" নাম দিয়ে নিরীহ জনগণের ওপর যে নির্মম দমন পীড়ন চালাচ্ছে তাকে এক কথায় রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস আখ্যা দেওয়াই হবে যুক্তিযুক্ত। এজন্য এই বোধ নামটা "অপারেশন উৎপীড়ন" হলেই যথার্থ হতো। জনগণের চোখে চুক্তি-উত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং চুক্তি-পূর্ব পার্বত্য চট্টগ্রামের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এই পার্থক্য না থাকার কারণ হলো সেনাবাহিনীর অপতৎপরতা তাদের মধ্যেই জারী থাকা।

গত ২১ জুলাই লক্ষ্মীছড়ি থানা পুলিশ পার্টির সচিব সদস্য অনুক চাকমাকে গ্রেফতার করে। তার বিরুদ্ধে কোন মামলা কিংবা গ্রেফতারী পরোয়ানা ছিল না। শ্রেফ ৫৩ ধারায় গ্রেফতার করে পরে মধ্যবর্তীত মামলায় তার নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জানা যায়, পুলিশ লক্ষ্মীছড়ি জোন কমান্ডারের চাপে তাকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয়েছিল। উক্ত জোন কমান্ডারের অপকীর্তি এলাকার পাহাড়ি বাঙালী সবার কাছে সুবিদিত। পাহাড়ি বাঙালি সবাইকে তার অন্যায় অত্যাচারের শিকার হতে হয়েছে। এলাকার কেউ তার বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস পায় না। এ অবস্থায় জনস্বার্থে স্বাধিকার বুলেটিনে জনগণের ওপর তার নির্যাতনের সংবাদ প্রকাশ করা হয়। এজন্য তিনি স্বাধিকার ও ইউপিডিএফ-এর ওপর অহেতুক ক্ষেপে যান। তার অধীন ইউপিডিএফ-এর সদস্যরাই স্বাধিকারে রিপোর্ট পাঠিয়ে থাকে। সেজন্য তিনি ইউপিডিএফ সদস্যদের হয়রানির মাত্রা বাড়িয়ে দেন। অনুক চাকমাকেও তিনি একই অজুহাতে পুলিশকে দিয়ে গ্রেফতার করেন। তার চরম অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরাচারী আচরণের কারণে ইউপিডিএফ-এর পক্ষে লক্ষ্মীছড়িতে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

জনগণের দেয়া ট্যাক্সের টাকায় রাষ্ট্রের কোষাগার চলে। সেনাবাহিনীর সদস্যরা সেই রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে বেতন নেন। অথচ জনগণের টাকা থেকে বাড়িতার সেনা কমান্ডার জনগণের ওপর কেবল খবরদারি নয়, তারা তাদের ওপর নিষ্ঠুর দমন পীড়ন চালাচ্ছেন। এতে স্বাভাবিকভাবে পুরো সেনাবাহিনীর ভাবমূর্তি বৃদ্ধি করে না।

এ কথা মনে রাখা দরকার, স্বাধিকারে কোন সেনা কমান্ডারের বিরুদ্ধে প্রাতস্বরে মিথ্যাভাবে রিপোর্ট ছাপা হয় না। যদি এমনটা সত্য যে, এই সব উৎপীড়ক সেনা কমান্ডারদের নির্যাতনের সব খবর স্বাধিকারের মতো একটি অনিবন্ধিত ও স্বল্প কলেবরের বুলেটিনে ছাপানো সম্ভব হয় না। অনেকে হয়তো প্রশ্ন তুলতে পারেন পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনী "উন্নয়নমূলক" না "সেনামূলক" কাজও তো করে থাকে, অথচ তার রিপোর্ট স্বাধিকারে দেখা হয় না কেন? এ প্রসঙ্গে আমরা প্রথমত বলতে চাই, তথাকথিত কাউন্টার-ইনসার্জেন্সির কৌশলের অধীনে পরিচালিত তাদের "উন্নয়নমূলক" বা "সেনামূলক" কাজও প্রশ্নে প্রশ্নে। দ্বিতীয়ত, স্বাধিকার জনগণের মুখপত্র। সেনাবাহিনীর বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশের জন্য তাদের নিজস্ব মুখপত্র রয়েছে এদেশের অসংখ্য পত্র পত্রিকা রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনাবাহিনী সম্পর্কে আরো অনেক কথা বলা যায়। যেমন তার মধ্যে একটি হলো, ঘনোশন পাওয়ার আশায় অপারেশনের নামে গ্রামে গ্রামে হানা দিয়ে সাধারণ লোকজনকে ধরে এনে তাদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র গুঁজে দিয়ে সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করা। "সন্ত্রাসী ধরার সাফল্য" প্রদর্শনের এই জঘন্য প্রবণতা ইদানিং আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অধিকাংশ সেনা কমান্ডারের জন্য এটা একটি Favourite pastime হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমরা জানি সেনাবাহিনী সম্পর্কে কথা বলা এদেশে কেবল স্পর্শকাতর বিষয় নয়, রীতিমত দাসফেমাস বা ধর্মাপরাধের সামিল। তা সত্ত্বেও আমরা জনগণের স্বার্থে সরকারের কাছে এবং সেই সাথে যারা রাষ্ট্রীয় নীতি পরিকল্পনার সাথে যুক্ত তাদের কাছে অনুরোধ জানাতে চাই, পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত সেনাবাহিনীর বিভিন্ন সেনা কমান্ডারের কার্যকলাপ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা হোক এবং অচিরেই রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বন্ধ করা হোক।

চিঠিপত্র

লংগদুতে জেএসএস-এর আন্দোলনের স্বরূপ

বর্তমানে লংগদুর পরিস্থিতি খুবই অস্বাভাবিক। জেএসএস সদস্যরা জনগণের কাছ থেকে চাঁদা তুলছে, সন্ত্রাস চালাচ্ছে আর মদ, জুয়া তিলিয়ারে ডুবে আছে।

তাইবোশহড়া বাজারে কালেক্টরের দায়িত্বে আছে অজয় মনি চাকমা ও টোগোল চাকমা। আর মাছ ব্যবসায়ী, গরু ব্যবসায়ী ও বাজার কমিটির লোকজন থেকে অস্ত্র দেখিয়ে চাঁদা নেয়। চাঁদা দিতে না চাইলে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। জনগণ এখন আতঙ্কের মধ্যে দিন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন।

জেএসএস-এর অস্ত্রধারী চাঁদাবাজরা হলো মিঠু বন্ধু চাকমা (বিটেল), ৩৭, সমরজ চাকমা (৪০) পিতা লোয়াজম চাকমা, গোপাল চাকমা ওরফে টোগোল, ২৫, পিতা তুলামনি চাকমা, সুখময় চাকমা (৩৫), বিপুল চাকমা (৪০), অজিত মনি চাকমা (৪০), নিজর চাকমা (২০), নীলবর্ণ চাকমা (৩৫), সুহৃদ বাণ, শুভধন চাকমা (২০) পিতা মৃত ধন মোহন চাকমা, মধু মিলন চাকমা (২২) পিতা লোক মঙ্গল চাকমা, বিপদ চাকমা (২০) পিতা মৃত কালোতন চাকমা, শিবাশিষ চাকমা (২০) পিতা বিলেষ চোলা চাকমা, মন কুমার চাকমা (৪০) পিতা নাক রঙা চাকমা, বিকল চাকমা (৪২), গত্র লোচন চাকমা (৪৪)।

এছাড়া গ্রামের পপলাইনের নাবিত্বে আছে নীলবর্ণ চাকমা। চাঁদা উত্তোলনের পর তারা কমেশ কুমার চাকমার বাড়িতে নিয়মিত মদ ও জুয়ার আসর বসিয়ে থাকে। সেখানে আরো চলে তিলিথি-তে পেয়ারা ছবির ঘনঘনী। এতে যুবক যুবতীরা বিপথে যাচ্ছে। এই হলো লংগদুতে জেএসএস-এর আন্দোলনের স্বরূপ। দেশে সন্ত্রাস বাবুর প্রতি আহ্বান, আপনার বর্বরবাহিনীর এ সমস্ত কার্যকলাপ অচিরেই বন্ধ করুন। না হলে এলাকার জনগণ এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে বাধ্য হবে।

সুজন দেওয়ান

লংগদু থেকে, ১১-০৮-২০০৫

ফিলিস্তিনি ভূমি থেকে ইসরাইলী সেটলার প্রত্যাহার - এর তাৎপর্য

সত্যদর্শী

> গাজা থেকে সেটলার প্রত্যাহার ফিলিস্তিনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। কিন্তু প্রথমেই ফিলিস্তিনি ভূমিতে ইসরাইলী দখলদারিত্ব বজায় থাকছে, অবরুদ্ধ গাজা/পশ্চিম তীরের সাথে বাইরের সংযোগ নিয়ন্ত্রণ করবে ইসরাইল। পশ্চিম তীরের ভাগ্য কী হবে তা আজো জানা নয়। ফিলিস্তিনের প্রতিরোধের সামনে সেটাই থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারণের ডিজ-এনগেজমেন্ট প্ল্যান অনুসারে ইসরাইল গাজা ও পশ্চিম তীরের ২৫টি ইহুদি বসতি থেকে সেটলারদের প্রত্যাহার করে নিয়েছে। এর মধ্যে গাজার পুরো ২১টি ও পশ্চিম তীরের ১২১টি বসতির মধ্যে ৪টি বসতি ৩৮ বছর ধরে বেদখলে রাখার পর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পর ইসরাইল ঐ অঞ্চলসমূহ দখলে নিয়েছিল। শ্যারণের সরকার ১৭ আগস্টের মধ্যে গাজার সেটলারদেরকে চলে যেতে নোটিশ দেয়। এখানে ৮৫০০ ইহুদি বাস করে। নোটিশ পেয়ে অনেক সেটলার স্বেচ্ছায় চলে যায়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও গড়ে তুলতে চেষ্টা করে। কিন্তু ইসরাইলী আর্মি ও পুলিশের ৪০,০০০ হেভিওয়েট সদস্য তাদের জোর করে বাসে তুলে সরিয়ে দেয়। অভিসি ও সিএনএন টেলিভিশনে সরাসরি এসব দৃশ্য দেখানো হয়।

ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী এরিয়েল শ্যারণ

প্রত্যেক সেটলার পরিবারকে ১,৫০,০০০ থেকে ৪,০০,০০০ ডলার ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়। ইসরাইল যখন এসব এলাকা দখল করেছিল, তখন হাজার হাজার প্যালেস্টাইনীকে উচ্ছেদ করা হয়েছিল। এসব ফিলিস্তিনীরা এখন অন্যত্র শরণার্থী জীবন যাপন করছে। সেই সময় উচ্ছেদ হওয়া ফিলিস্তিনীদেরকে ইসরাইলের সরকারসমূহ কোন ধরনের ক্ষতিপূরণ দেয়ার প্রয়োজন মনে করেনি।

সেটলারদের সরিয়ে নেয়ার পর ইসরাইল এখন গাজা ও পশ্চিম তীরে তাদের বসতিগুলো বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দিচ্ছে। এরপর সেপ্টেম্বরের মধ্যে ইসরাইলী সেনারা গাজা ত্যাগ করবে। অতিরিক্ত প্যালেস্টাইনের নিরাপত্তা বাহিনী গাজার নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবে।

গাজা: যেখান থেকে সেটলারদের প্রত্যাহার করা হয়

ইসরাইলের চরম দক্ষিণপন্থীরা এরিয়েল শ্যারণের এই সেটলার প্রত্যাহার পরিকল্পনার তীব্র বিরোধীতা করেছিল। অর্থ মন্ত্রী ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন নেতানিয়াহু শ্যারণের মন্ত্রী সভা থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি সেটলার প্রত্যাহার পরিকল্পনার একজন কড়া সমালোচক। কিন্তু সমস্ত ধরনের বিরোধীতা ও দেশ ব্যাপী প্রতিবাদ-বিক্ষোভ সত্ত্বেও শ্যারণ তার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। বিশ্বের নেতৃবৃন্দ তার এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায়।

শ্যারণ-সরকার সেটলার প্রত্যাহারকে স্বেচ্ছামূলকভাবে শান্তির স্বার্থে করা হয়েছে বলে বিশ্বের কাছে উপস্থাপন করছে। কিন্তু প্যালেস্টাইনীরা মনে করেন এটা তাদের সংগ্রামের সাফল্য। কারণ প্যালেস্টাইনী মিলিটেন্টদের রকেট হামলার মুখে বাস্তবতঃ গাজায় ইহুদি বসতিগুলো রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। মুক্তিযোদ্ধার পূর্বে ফিলিস্তিনী জঙ্গি গ্রুপদের রকেট হামলার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল গাজা সেটলার এলাকা। প্রত্যেক বার যখন ইসরাইলী আর্মি ফিলিস্তিনি জঙ্গী নেতাদের হত্যা করে, তখন তার প্রতিশোধ হিসেবে এইসব বসতির ওপর মর্টার হামলা চালানো হতো।

গাজায় সবচেয়ে জনপ্রিয় হামাস সেটলার প্রত্যাহারের সময় হামলা বন্ধ রাখবে বলে ঘোষণা দেয়, তবে অস্ত্র ফেলে দিতে ইসরাইলের আহ্বান হামাস নেতারা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। কারণ যেখানে নিজভূমিতে দখলদার বাহিনী রয়েছে, সেখানে নির্যাতিত জনগণের জন্য অস্ত্র ধারণের অধিকার অবশ্যই থাকতে হবে। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত ঐতিহাসিক ৩৩১৪ নং প্রস্তাব প্রকারান্তরে অধিকৃত অঞ্চলের জনগণকে অস্ত্র ধারণের অধিকারকেই স্বীকৃতি দেয়।

ইসরাইলের জন্য গাজা উপত্যকা সামরিক বা কৌশলগত দিক থেকে কখনোই লাভজনক ছিল না। কয়েক হাজার সেটলারের নিরাপত্তা বিধানের জন্য সেখানে বিশটি সৈন্যবাহিনী রাখা সম্পদের অপচয় হিসেবে বিবেচিত হয়। বৃহত্তর ইসরাইলের যে মানচিত্র তাতে গাজা উপত্যকার স্থান নেই। সেই এখানে বাইবেল-বর্ণিত ঐতিহাসিক স্থানও।

অন্যদিকে, গাজায় ১.২ মিলিয়ন প্যালেস্টাইনীর বাস। তাদের বেকারত্বের হার পৃথিবীর সর্বোচ্চ বেকারত্ব-কবলিত অঞ্চলগুলোর মতোই। সেটলার প্রত্যাহার করলেও ইসরাইল ব্যবসা-বাণিজ্য ও লোকজনের চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করবে। ফলে গাজা প্যালেস্টাইনীদের জন্য হবে খুলনার কারাগারের মতো। সেখানে তারা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারবে না।

বিদেশী বিনিয়োগও সেখানে ইসরাইল অনুমোদন করবে না। নিরাপত্তার অজুহাতে গাজা অঞ্চল স্থল, সমুদ্র ও আকাশপথ সব দিকে অবরুদ্ধ থাকবে। কারণ এসবই ইসরাইলের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এখানে যে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আছে তাও খুলে দিতে ইসরাইল নারাজ। চলমান ইন্তিফাদার (অভ্যুত্থান) সময় এটা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। সেটলার সরিয়ে নিলেও ইসরাইল গাজার সীমান্ত, সমুদ্র তীর দেখা নিয়ন্ত্রণ করবে। তাছাড়া যে কোন সময় ইসরাইলী সৈন্য সেখানে ঢুকতে পারবে। ফলে দখলদারিত্ব থাকছেই। তা সত্ত্বেও হামাস, ইসলামিক জিহাদ ও আল আকসা ব্রিগেডই গাজা থেকে সেটলার প্রত্যাহারে বাধ্য করেছে বলে প্যালেস্টাইনীদের বিশ্বাস।

শ্যারণ-সরকার গাজা থেকে সেটলার সরিয়ে নিলেও পশ্চিম তীরে বসতিস্থাপন সম্প্রসারণ করবে বলে ঘোষণা দিয়েছে। একদিকে যখন গাজা থেকে সেটলার প্রত্যাহার করা হচ্ছিল, অন্যদিকে ইসরাইল একই সময় পশ্চিম তীরে নতুন বসতি ও রাস্তাঘাট নির্মাণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত রোড ম্যাপ এর পরিপন্থী। রোড ম্যাপ অনুসারে ইসরাইল কেবল গাজা নয়, পশ্চিম তীর ও জেরুজালেমের ইহুদি বসতিস্থাপনাগুলোও ছেড়ে ফেলতে বাধ্য। আমেরিকার সমর্থনে ইসরাইল আন্তর্জাতিক চাপ উপেক্ষা করে চলেছে।

গাজা থেকে সেটলার প্রত্যাহার নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ। কিন্তু যতদিন ফিলিস্তিনি ভূমিতে ইসরাইলী দখলদারিত্ব বজায় থাকবে, যতদিন না ফিলিস্তিনীরা নিজ ভূমিতে ফিরে আসার অধিকার পাবে, ততদিন ফিলিস্তিনীদের রাষ্ট্রগঠনের সংগ্রাম চলতেই থাকবে।